কমপিউটার মানেই রোমান হরফ

মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বয়স ৫০ বছর পার হলেও এর সাথে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বা তার বাংলাভাষার সম্পর্কের সময়টা এত বড় নয়। রোমান হরফ পর্দায় নিয়ে কমপিউটারের জন্ম। বাংলাদেশেও রোমান হরফের প্রদর্শন করেছে কমপিউটার। একেবারে হিসেব করে বলা যায়, ১৯৮৭ সালে ডেস্কটপ প্রকাশনার সময় থেকে সাধারণ মানুষের সাথে কমপিউটারের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধন্যবাদ অ্যাপল কমপিউটার ও তার নির্মাতা স্টিভ জবসকে। তাদের আগে কেউ কমপিউটারের পর্দায় সাধারণ মানুষের ভাষা দেখাবে বলে আশাই করেনি। কমপিউটারের ভাষা রোমান এবং কমপিউটারের পর্দায় রোমান হরফ থাকবে, সেটাই সবার স্বাভাবিক ধারণা ছিল। যদিও কমপিউটারের ভাষা ইংরেজি নয়, তবুও কমপিউটার জানার, বোঝার, চালনার ভাষা রোমান হরফেই লেখা হতো। ভাবটা এমন ছিল, প্রোগ্রামিং ভাষা যা মোটেই ইংরেজি নয় তাকেও ইংরেজি বলেই চালানো হতো। রোমান হরফের অঞ্চলে জন্ম নেয়া কমপিউটারের কাছ থেকে এরচেয়ে ভালো কিছু আমরা প্রত্যাশা করিনি। স্টিভ জবস হলেন এই ধারণার বিপরীত স্রোতের মানুষ। ইতিহাস বলে, বাংলা ভাষাভাষী অনেকেই রোমান হরফের আধিপত্যের কমপিউটারের পর্দায় বাংলা হরফ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। হেমায়েত হোসেন বা সাইফুদ্দাহার শহীদের মতো মানুষ তো বসে থাকেননি। এমনকি প্রো ডস বা ডস অপারেটিং সিস্টেমেও বাংলা চর্চার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বিপ্লবটা ঘটায় আনন্দপত্র ১৯৮৭ সালের ১৬ মে। প্রকাশিত হয় কমপিউটার দিয়ে কম্পোজ করা প্রথম বাংলা পত্রিকা। আর সেই পত্রিকার কাজ যারা করে তারা না প্রোগ্রামার, না ইংরেজি জানা মহামানব। তখনই প্রয়োজন পড়ে সাধারণ মানুষের ভাষায় কমপিউটার চালানোর। বস্তুত তখন থেকেই কমপিউটারের উপাত্তগুলো সাধারণ মানুষের ভাষায় পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কোনো মতে বাংলায় লেখাপড়া করে যারা কমপিউটারের বোতাম ছুঁয়েছিল, তারা কমপিউটারের সিনটেক্স তো বুঝত না, এমনকি বুঝত না সংলাপ ঘরটি। মূল কমপিউটারের শব্দগুলো বাংলায় লিখে এর চালনা পদ্ধতিতে বাংলায় লিখে দেয়া হতো। তখনই একটি অসাধারণ কাজ করেছিলেন প্রকৌশলী সাইফুদ্দাহার শহীদ। তিনি পুরো কমপিউটারের অপারেটিং সিস্টেম ও লেখার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বাংলায় করে ফেলেন। সেই সময়ে আমি যখন বাংলায় কমপিউটার শেখাতাম, বাংলায় কমপিউটারের বিষয় নিয়ে লিখতাম, তখন অনেকেই হাসিঠাট্টা করেছেন। বন্ধু মরহুম আবদুল কাদের যখন বাংলায় কমপিউটারবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখনও বিদ্রূপের হাসি হেসেছেন অনেকে। তারও আগে যখন বিজ্ঞানবিষয়ক লেখালেখি বাংলায় করার জন্য আবদুল্লাহ আল মূতি শরফুদ্দিন ও আবদুল কাদেরসহ অনেকেই যুদ্ধ করেছেন, তখনও এ নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করা হতো। প্রথমদিকে কাদের সাহেবকে তার পত্রিকার একটি বড় অংশ রোমান হরফের জন্য ছেড়ে দিতে হতো। বস্তুত আবদুল কাদেরকে কমপিউটার বিষয়ের বাংলা লেখকগোষ্ঠী ও সাংবাদিক গড়ে তুলতে হয়েছে। তাদের জন্যই আজ আমরা বাংলাভাষায় কমপিউটার চর্চা করি। তিনি যদি পরাস্ত হতেন তবে আমাদের পক্ষে বাংলাভাষায় কমপিউটার চর্চা হয়তো করাই হতো না। আমার মনে আছে ১৯৯২ সালে যখন নবম-দশম শ্রেণীতে কমপিউটার বিষয়টি পাঠ্য করা হয়, তখন বাংলাভাষায় পাঠ্যবই লেখার কথা ভাবতে কষ্ট হয়েছে। তবে প্রায় তিন দশকে বাংলাভাষায় কমপিউটার চর্চা শুধু যে মূল স্রোত হয়েছে তাই নয়, এখন আমরা বাংলাভাষায় লেখা বই ভারতসহ সারা দুনিয়াতে রফতানি করি। কিন্তু ২৮ বছর পর আজ অনুভব করছি, বাংলাভাষায় কমপিউটার চর্চার পথটা মোটেই মসৃণ নয়। বরং দিনে দিনে সেই পথটা এবড়োথেবড়ো ও বিপদসঙ্কুল হচ্ছে। আজ যখন কমপিউটারে বাংলা চর্চার কোনো সীমাবদ্ধতাই নেই, তখন কমপিউটার ব্যবহারের নামে বাংলাভাষাকে ঝেটিয়ে বিদায় করা হচ্ছে। আমাকে যদি দৃষ্টান্ত দিতে বলা হয়, তবে আমি হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দিতে পারব, যেখানে কমপিউটারের দোহাই দিয়ে বাংলাভাষাকে বিদায় করা হয়েছে। দেশের সংবিধানে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা থাকলেও, বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট নির্দেশ থাকার পরও, বাংলাভাষা বিষয়ক আইন থাকার পরও অবস্থার দিনে দিনে অবনতি হচ্ছে। আমি আজকের আলোচনায় সেইসব প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত বলব না। তবে কমপিউটার শেখাকে যে রোমান হরফের দাসে পরিণত করা হয়েছে সেটি তো বলতেই হবে।

বন্ধু মরহুম আবদুল কাদের যখন বাংলায় কমপিউটারবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখনও বিদ্রূপের হাসি হেসেছেন অনেকে। তারও আগে যখন বিজ্ঞানবিষয়ক লেখালেখি বাংলায় করার জন্য আবদুল্লাহ আল মূতি শরফুদ্দিন ও আবদুল কাদেরসহ অনেকেই যুদ্ধ করেছেন, তখনও এ নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করা হতো। প্রথমদিকে কাদের সাহেবকে তার পত্রিকার একটি বড় অংশ রোমান হরফের জন্য ছেড়ে দিতে হতো। বস্তুত আবদুল কাদেরকে কমপিউটার বিষয়ের বাংলা লেখকগোষ্ঠী ও সাংবাদিক গড়ে তুলতে হয়েছে। তাদের জন্যই আজ আমরা বাংলাভাষায় কমপিউটার চর্চা করি। তিনি যদি পরাস্ত হতেন তবে আমাদের পক্ষে বাংলাভাষায় কমপিউটার চর্চা হয়তো করাই হতো না।

গত মার্চ মাসে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ডিজিটাল বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের দুটি পর্ব ধারণ করার জন্য আমি শেরেবাংলা নগরের বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল ভবনে গিয়েছিলাম। আলোচ্য বিষয় ছিল বিশ্বব্যাংকের ৭০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প। প্রকল্প পরিচালকসহ অনেকের সাথে কথা বলার পর জানা গেল, এই প্রকল্পের আওতায় সরকার ৩৫ হাজার তরুণ-তরুণীকে কমপিউটার শেখাবে। এরই মাঝে এফটিএফএল নামে দুটি ব্যাচে ২৭৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এদের সফলতা উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যা ৪ হাজারে উন্নীত করা হবে। এর বাইরে ১ হাজার জনকে মধ্যম পর্যায়ের কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এর বাইরে ১০ হাজার স্নাতককে উচ্চতর ও ২০ হাজার জনকে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

প্রকল্পটি সম্পর্কে আমি অনেক আগে থেকেই জানি। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি থাকার সময় বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদের সাথে বারবার এ বিষয়ে কথা বলেছি।

সেদিনই বিসিসি ভবনেই জানলাম, ২০ হাজার জনকে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ▸

প্রথম পদক্ষেপটি হচ্ছে ঢাকার ইডেন কলেজের হাজার খানেক মেয়েকে একটি পরীক্ষায় বসানো হবে এবং সেখান থেকে ২০০ মেয়েকে বাছাই করে তাদেরকে ১০ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে সেখান থেকে ১০০ মেয়েকে বাছাই করে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তথ্যটি জানার পর আমার নিজের মনে হলো বিটিভির অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য আমি ইডেন কলেজে গেলাম। মেয়েদের সাথে কথা বললাম।

কিন্তু চমকে গেলাম তাদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখে। প্রশ্নপত্রটির পুরোটাই বস্তুত ইংরেজি পরীক্ষার। বাক্য গঠন থেকে শুরু করে ইংরেজি জানার সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন। আমি নিজের কাছেই প্রশ্ন করলাম, ইডেন কলেজের সাধারণ ছাত্রীরা যাদেরকে কমপিউটার কেমন করে চালাতে হয়, কেমন করে ইন্টারনেট চালাতে হয়, গ্রাফিক্স ডিজাইন কীভাবে করতে হয় বা অ্যানিমেশন কেমন করে করতে হয়, সেসব শেখানোর জন্য বাছাই করতে গিয়ে পুরো পরীক্ষাটাই ইংরেজিতে নিতে হবে কেন? ওদের ইংরেজি জ্ঞানটাই কি প্রধান বিবেচ্য বিষয়? বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শতকরা ৯৭ ভাগ ছাত্রছাত্রী বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা ইংরেজি জানে, কিন্তু ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের মতো জানে না। ওরা নিজের দেশে কাজ করার জন্য ইংরেজিতে যতটা দক্ষতা থাকা দরকার ততটাই জানে। বিদেশেও এরা কাজ করে। মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়াতে এরা ইংরেজিতে দক্ষ না হয়েই কাজ করছে। শুধু সিলেটি জেনে এরা লন্ডন দখল করেছে। আবার যদি ডেনমার্কে গিয়ে কাজ করতে হয় তবে এরা ডেনিশ ভাষাও শিখে নেয়। যারা জাপানে যায় তারা প্রয়োজনে জাপানি ভাষা শিখে। জার্মানি-ফ্রান্স-ইতালিসহ ইউরোপের সব দেশে সেই দেশের ভাষা জানতে হয় এবং এরা সেসব আয়ত্তও করে। আমরাও আমাদের স্নাতক পরীক্ষা বাংলায় দিয়েছি। এতে আমাদের কারও মেধা আটকে আছে বলে তো মনে হয় না। কমপিউটার জানার জন্য ইংরেজি জানতেই হবে, এমন কোনো ঘটনা তো আমার জানা নেই। বরং ওদের সাধারণ জ্ঞান কেমন, বুদ্ধিমত্তা কেমন, দুনিয়ার খবরাখবর ওরা কি রাখে, দেশ সম্পর্কে কতটা জানে, তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে কি খবর রাখে, ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে কি না– এসব দক্ষতা যাচাই করা যেত। যাচাই করে দেখা যেত তারা শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে কি না।

পরে জেনেছি, যে প্রতিষ্ঠান এই প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করছে সেটি একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। এরা ইংরেজিতে প্রশিক্ষণ দেবে। ফলে এরা তাদেরকেই বাছাই করছে, যারা ইংরেজি জানে। এর অর্থটা অত্যন্ত স্পষ্ট, দেশের শতকরা ৯৬ ভাগ ছাত্রছাত্রী বিশ্বব্যাংকের এই প্রকল্প থেকে প্রথমেই বাদ পড়েছে। তাদের যতই জ্ঞান-বুদ্ধি বা দক্ষতা থাকুক না কেন, ওরা সরকারের এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবে না। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যারা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করেছে তারা পুরো সুযোগটাই নিতে পারবে।

আমরা জানি, এখন দেশে যার সাথেই কথা বলবেন, তিনিই বলে দেবেন ইংরেজি না জানলে দুনিয়াতে টিকে থাকা যাবে না। ইংরেজি ভাষা নয়, প্রযুক্তি। তারা বলবেন, সফটওয়্যার রফতানি করতে হলে ইংরেজি লাগে। কমপিউটারের নাম নিলেই ইংরেজির কথা ওঠে। যদিও আমি হলফ করে বলতে পারি, যারা কমপিউটার দিয়ে বিদেশের কাজ করে তারাও ভালো ইংরেজি জানে না এবং জানার প্রয়োজনও হয় না। বাংলাদেশ কলসেন্টার সংস্থাগুলোর সভাপতি আমাকে জানিয়েছেন, তাদের ব্যবসায়টা যেখানে বিদেশনির্ভর ছিল সেটি এখন দেশনির্ভর হয়ে পড়েছে এবং তাদের কর্মীদেরকে এখন বাংলা শেখাতে হচ্ছে। দেশী কলসেন্টারের লোকজনকে বরং সুন্দর করে ভালো উচ্চারণে বাংলা বলতে হচ্ছে। আমিও মনে করি, আমাদের রফতানি বাজারের চেয়ে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি বাজার বহুগুণ বড়। সফটওয়্যার ও সেবা খাতের যেসব লোককে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে তাদের শতকরা ৯০ জনকেই দেশের ভেতরেই কাজ করতে হবে। তাদের জন্য ইংরেজি জানার চেয়ে কমপিউটার জানাটাই বেশি জরুরি। তবুও যদি ইংরেজির দক্ষতা প্রয়োজনই হয়, তবে সেটি প্রশিক্ষণ চলাকালে দেয়া যায়। কমপিউটারে কাজ করতে শেখা কেউ মাতৃভাষায় যত সহজে বুঝতে পারবে, দুনিয়ার অন্য কোনো ভাষায় সেটি পারবে না। আমরা ইতোমধ্যেই বাংলাভাষায় কমপিউটার শেখার জন্য লিখিত, অডিও ভিজ্যুয়াল এবং মাল্টিমিডিয়া উপাত্ত তৈরি করেছি। সেসব শিক্ষা উপকরণ দিয়ে দেশে তিন দশক ধরে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। বস্তুত কমপিউটারের এমন কোনো বিষয় নেই, যার বিষয়ে বাংলায় বই নেই। এমতাবস্থায় প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বাংলায় প্রশিক্ষণ দিয়ে ইংরেজি শেখানো যায়। যদি কোনো বিষয় ইংরেজিতে শেখাতেই হয়, তবে বাছাই করার পর তাদেরকে ইংরেজি শিখিয়ে তারপর সেই বিষয়টি শেখানো যায়।

আমি যদি ভাষা নিয়ে আবেগের কথা উল্লেখ নাও করি, তবুও এই কথাটি আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি– বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক ইংরেজিতে দক্ষ নয় বলে কোনো ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। এটি বাস্তব যে, দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের জন্য যেসব উদ্যোগ থাকা উচিত ছিল সেগুলো নেয়া হয়নি। ইংরেজির নামে দেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এভাবে যদি চলতে থাকে তবে বাংলাদেশে বাংলাভাষাই বিদেশী ভাষা হয়ে যাবে।

২৮ বছরে আমরা কমপিউটারের পর্দায় রোমান হরফের বদলে বাংলা হরফের যে রাজত্ব কায়েম করেছি, সেটি কোনোভাবেই নষ্ট হতে দিতে পারি না। দেশের মানুষের ঋণের টাকায় মুষ্টিমেয় কিছু ইংরেজি জানা লোক সুযোগ নেবে, সেটির বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতেই হবে কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com